শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের বিকাশ কোথায়?

(পত্রিকায় প্রকাশিত শিরোনাম 'মনুষ্যত্ব ছাড়া মানুষ হয় নাকি?')

একজন শিক্ষক হওয়াতে আমি সবকিছুর মধ্যে শিক্ষা খুঁজে বেড়াই, এটা আমার স্বভাব। এদেশের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্ব-সঞ্চারক শিক্ষা খোঁজা কতটা যৌক্তিক ও সে নিরপেক্ষতা আমি বজায় রাখতে পারি কিনা, তা নিয়ে আমার সন্দেহ আছে। অনেকে হয়তো ভ্রু কুঁচকে বলতে পারেন, "মনুষ্যত্ব শুধু পুরোনো অভিধান এবং পুরোনো অভিধান-পড়া ন্যুব্জপ্রায় মাস্টারসাহেবদের মাথায় দানা বেঁধে আছে। সমাজের কোথাও তো এসব আর নেই, পুরোনো এ ভূত তাড়াতে হবে। আমরা আধুনিক বস্তুবাদ ও ভোগবাদের স্বর্ণযুগে আবার সেই ক্ষয়ে-যাওয়া, হারিয়ে-যাওয়া 'মনুষ্যত্বের বিকাশ' কথার অবতারণা করে ব্যক্তি-স্বাধীনতা খর্ব করছি কিংবা পত্রিকায় জায়গা দখল করছি"। এ বিষয়গুলো নিয়ে আত্মবিস্মৃত অতি-আধুনিক এই সমাজে তর্ক করার সৎসাহস বলুন আর দুঃসাহস বলুন– তা আমার নেই। আমার শুধু একটাই বিশ্বাস যে, এই নীতিহীন ধ্বংসোন্মুখ সামাজিক অবক্ষয়ের মূলে সমাজে বসবাসরত মানুষ নামের শ্রেষ্ঠ প্রাণির মধ্যে মনুষ্যত্বের অভাবই দায়ী। মানবিক গুণাবলীর উজ্জীবন ও বিকাশ ছাড়া মানবজাতি এ সমাজে টিকতে পারবে না, মাথা উচু করে দাঁড়াতেও পারবে না। সুতরাং শিক্ষায় মনুষ্যত্ববোধের উজ্জীবন ও সঞ্চালন যে কোনো মূল্যে ঘটাতে হবে। মানুষকে ক্রমেই আরো সভ্য বানাতে হবে। সৃষ্টির সেরা জীব তৈরির উদ্দেশ্যকে সফল করতে হবে।

শিক্ষার সাথে বিভিন্ন বিষয়ের সম্পর্ক নিয়ে অনেক নিবন্ধ আমি এ কলামে লিখি। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষার তিনটি উপাদান একটা শিক্ষাব্যবস্থায় থাকতেই হবে, নইলে শিক্ষা অপূর্ণ রয়ে যায়। উপাদান তিনটিও বারবার লিখি: ১. জীবনমুখী শিক্ষা; ২. মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা; এবং কর্মমুখী শিক্ষা। তিনটি উপাদানের পুরোটা এক নিবন্ধে লেখা সম্ভব নয়। সেজন্য আজ মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষা নিয়ে দুকথা বলার আশা রাখি। আগেই বলে রাখা ভালো যে, কোনো কোনো বিষয় আছে তিনটি উপাদানের মধ্যে পারস্পরিকভাবে একটির সাথে আরেকটি জড়িয়ে যেতে পারে। তবে তিনটির একটিকেও বাদ দিলে শিক্ষার কার্যকারিতা থাকে না বা শিক্ষার উদ্দেশ্য সাধন হয় না। আবার শিক্ষা ছাড়া সমাজ বন-জঙ্গলে রূপ নেয়।

আমাদের সমাজ গতিশীল, নিয়মিত পরিবর্তিত হচ্ছে। পরিবর্তনটা নিম্নমুখী, না ঊর্ধ্বমুখী, এটা অবশ্যই বিবেচনার দাবি রাখে, যদিও এদেশে গোষ্ঠীস্বার্থ-সর্বস্ব রাজনীতি চর্চা করতে গিয়ে মনুষ্যত্ববোধ আমরা হারিয়ে ফেলেছি। মানুষের জন্যই সমাজ। সমাজে মানুষ বাস করে। সমাজের নিম্নমুখী পরিবর্তন হতে হতে ক্রমেই বুনো আবহে রূপ নিক, এটা নিশ্চয়ই আমরা কেউ চাই না। অথচ তা-ই হয়ে চলেছে। সেক্ষেত্রে বুঝতে হবে, মানুষ তার মনুষ্যত্ব হারাচ্ছে। মানুষ মনুষ্যত্ব হারালে কী হয়? উত্তর একটাই– মানুষ পশুর সমতুল্য হয়ে যায়। মানুষ আর পশুর মধ্যে কোনো পার্থক্য তখন থাকে না। পার্থক্য একটা থাকে: মানুষ দু-পায়ে হাঁটে আর পশু চার পায়ে হাঁটে। এটা দেখে যখন মানুষ না পশু চিনতে হয়, স্বভাবে চেনা যায় না, তখন মানুষের শ্রেষ্টত্ব আর থাকে না, সমাজ বসবাসের উপযুক্ততা হারায়। মনুষ্যত্ব আছে বলেই বিধাতা সৃষ্ট সকল প্রাণির মধ্যে এ প্রজাতির প্রাণিকে শ্রেষ্টত্ব দিয়েছে এবং মানুষ নামে অবিহিত করেছে। মনুষ্যত্বই যদি না থাকে, এ প্রাণিটা মানুষ নাম ধারণ করে কী করে! আমাদের সমাজে আমরা 'আত্মজিজ্ঞাসা' শব্দটা ভুলতে বসেছি। শুধু এক দিনের দৈনিক পত্রিকাটা পড়ে দেখুন। নিশ্চয় চোখে ধরা পড়বে, আমাদের মধ্যে মনুষ্যত্ববোধ আছে, কি নেই বা কি মাত্রায় আমরা এটাকে ক্রমেই হারাচ্ছি। আমি তো বাস্তব জীবনে ঘরে দরজা দিয়ে বসে থাকি না, এ সমাজেই ঘুরছি-ফিরছি, কাজ করছি, সমাজকে পর্যবেক্ষণ করছি। সমাজ ও রাষ্ট্রের যেখানেই সমস্যা দেখি, সেখানেই মনুষ্যত্বের অভাব চোখে পড়ে। সমাজের মানুষের মধ্যে মনুষ্যত্বের মাত্রা যে কি পরিমাণে হ্রাস পেয়েছে, ভাবলে অবাক লাগে, গায়ে কাঁটা দিয়ে ওঠে; বিধাতার তৈরি সৃষ্টি-সেরা খলিফা (প্রতিনিধি)– মানব জাতির এহেন দশা দেখে ঘৃণায় মনটা রি রি করে। অনেক মানুষের চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে অন্য কোনো প্রাণি থেকে তাদেরকে আলাদা করা কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। এদেশ ও সমাজ পরিচালকদের চোখে এগুলো ধরা

পড়ে না, শুধু আমার মতো কতিপয় মাস্টারসাহেবদের চোখেই ধরা পড়ে– এমনটি ভেবে আমার বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার করার দরকার নেই। একবার ভেবে দেখুন– আমরা কোথায় চলেছি! সমাজ ও দেশ-চালকদের শুধু অনুরোধ করে বলি, 'ভিক্ষার দরকার নেই মা, তোমার কুকুর ঠেকাও'। অনেকের সাথেই এ বিষয়ে কথা বলেছি। সমাজের আরো যাদের চোখে এসব ধরা পড়ে, তারা সমাজ-বিতাড়িত হয়ে ঘরে স্বেচ্ছা-নির্বাসিত হয়েছে। তাদের চলমান এই সমাজে কিছু দেওয়ারও মনে হয় নেই। এ সমাজে তারা ব্যাক-ডেটেড ও বোকা বনে গেছে।

'মনুষ্যত্ব' একটা শব্দ, কিন্তু অনেক গুণের সমাবেশ, যেমন– সততা, নৈতিকতা, মানবিক মূল্যবোধ, সমাজ-হিতৈষণা, দেশপ্রেম, জাগ্রত বিবেক, ধর্ম-কর্ম, অহিংস মন-মানসিকতা, প্রতিটা জীবের প্রতি সহমর্মিতা, পরমতসহিষ্ণুতা, উদারতা ইত্যাদি। একটু ভেবে দেখি তো, এগুলো আমাদের সমাজে কতটুকু বিদ্যমান? এগুলোর অভাব থাকলে সমাজ ও দেশ ভালোভাবে চলবে কীভাবে? এগুলো মানুষ একদিনে বা এক মাসের মধ্যে ইচ্ছে করলেই অর্জন করতে পারে না। উন্নত জাতি গড়তে গেলে এসব কাল-পরম্পরায় বসবাসরত মানুষের মধ্যে আসতে হয়। আদর্শ সমাজে এ গুণগুলো থাকতে হয়। এসব সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মাধ্যমে নতুন প্রজন্ম শেখে ও চর্চা করে। আমাদের দেশে এসব না আছে সামাজিক শিক্ষার মধ্যে, না আছে প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার মধ্যে। মনুষ্যত্বের গুণই আমাদের মধ্যে না থাকলে, আমাদের কিসের এত বড়াই! কীসের এত বড় বড় লেফাফাদুরস্ত বক্তৃতা!

জন্মানোর পর থেকে মানুষ প্রকৃতি-প্রদত্ত কিছু শিক্ষা লাভ করে। সে শিক্ষা মানুষকে মানুষের মতো মানুষ তৈরি করে না। খিদে পেলে খাবারের কথা ভাবতে শেখায়। শীত লাগলে তা নিবারণের জন্য কোনো গরম জায়গার আশ্রয় খোঁজে ইত্যাদি। কিন্তু মানুষকে সমাজবদ্ধ হয়ে বাস করতে গেলে, মানুষের মতো ভাবনা-চিন্তা করতে গেলে এবং সভ্য সমাজের একজন সদস্য বলে দাবি করতে গেলে মনুষ্যত্ববোধ-সঞ্চারক শিক্ষার কোনো বিকল্প নেই। অথচ ক্লাসে পঠিত কোনো বইতে এগুলো আনতে ও শেখাতে আমরা খুবই গড়িমসি করি। এসব গুণাবলীকে পাশ কাটিয়ে আমরা আমাদের ছাত্রছাত্রীদের মহামানব তৈরি করার তালিম দিই। 'আকাশে শান্তির নীড়' রচনায় প্রবৃত্ত ও প্রবুদ্ধ হই। বিষয়টা কতটুকু বাস্তবসম্মত? একথা আমি জানি যে, ছেলেমেয়েদের একটা নির্দিষ্ট বয়সের মধ্যে– প্রথম থেকে বড়জোর হাইস্কুলের শেষ পর্যায় পর্যন্ত মনুষ্যত্বের বীজ মনের গহীনে বুনে দিতে না পারলে পরবর্তী সময়ে মনুষ্যত্বের বৈশিষ্ট্য তাদের মনে, চিন্তা-চেতনায় ও কর্মে আর ধারণ করে না; যাকে বলে, 'কাঁচায় না নোয়ালে বাঁশ, পাকলে করে ঠাস ঠাস'। দুধ একবার ঘোলে রূপান্তর হয়ে গেলে সেখান থেকে মাখন পাওয়ার চেষ্টা দুরাশা। আমি নিজেও দেখেছি, কোনো ছাত্র-ছাত্রী আন্ডারগ্রাজ্যুয়েট ও গ্রাজ্যুয়েট লেভেলে যতই 'প্রফেশনাল এথিক্স', 'বিজনেস এথিক্স' পড়িয়ে 'এ' গ্রেড অর্জন করুক না কেন, কর্মজীবনে গিয়ে অনেকেই দুর্নীতি কিংবা যে কোনো অসদুপায় অবলম্বন করতে দ্বিধা করে না। মূলত প্রাথমিক পর্যায় থেকে হাইস্কুল পর্যন্ত মনুষ্যত্বের বীজ মনের গভীরে বপন করে দিতে না পারলে আজীবন আর মনুষত্বের চর্চা হয়ে ওঠে না। এ বিষয়ে প্রত্যেকের পরিবার একটা বিশেষ ভূমিকা পালন করে। এটা বাস্তবে দেখেছি। বর্তমানে যেহেতু সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষাব্যবস্থায় মনুষ্যত্বের চর্চা নেই বললেই চলে, এদেশের সমাজে যে মনুষ্যত্বের চর্চা যতটুকুই চলছে– তা নিজ নিজ পরিবারিক শিক্ষারই অবদান। আবার কখনো 'গোবরেও পদ্মফুল ফোটে'– একথাও সত্য।

আমাদের শিক্ষাব্যবস্থায় অনেক পরিবর্তন করা হয়েছে। আমি আর ব্যাপক পরিবর্তনের কথা বলি না, শুধু এ সম্পর্কীত কতকগুলো দফা বা বিষয় (আইটেম) সিলেবাসে ঢুকাতে বলি। এর জন্য সদিচ্ছাই যথেষ্ঠ। বিবর্তনবাদের ধারায় 'মানুষ থেকে বানর পয়দা হয়েছে' না কি 'বানর মানুষে রূপান্তরিত হয়েছে'– এ তর্কে যাবার আমার আদৌ কোনো ইচ্ছা আজ নেই। আমি বর্তমান সমাজের মানুষকে মানবতার বৈশিষ্ট্য-সংবলিত সত্যিকারের মানুষরূপে চিন্তা-চেতনা ও কর্ম করতে দেখতে চাই, যাদেরকে আমি এদেশের মানবসম্পদ বলে গণ্য করতে চাই। নইলে আমরা চিৎকার করে বড় বড় যত আপ্তবাক্য মুখ দিয়ে উদ্‌গিরণ করি না কেন, 'সকলি গরল ভেল'। মানুষের সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় উন্নয়নের চেষ্টা অধরাই রয়ে যাবে। এজন্য শিক্ষার পাঠ্যসূচিতে শিক্ষার্থীর মনুষ্যত্ব জাগ্রত করতে পারে এমন শিক্ষা

অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। শিক্ষায় 'ইন্টিগ্রেটেড শিক্ষাপদ্ধতি'র প্রচলন করতে হবে। এসব করতে সরকারের বেশি একটা টাকা খরচ হবে না। 'মনুষ্যত্ববোধ-জাগরণ কত প্রকার ও কি কি' ইত্যাদি মুখস্ত করিয়ে ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটানো যাবে না। তাদেরকে ব্যবহারিকভাবে এ শিক্ষার তালিম দিতে হবে, শিক্ষায় মানবিক গুণাবলীর প্রয়োগ করতে হবে, চর্চা করাতে হবে। সামাজিক ও প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষায় এ গুণের বাস্তবায়ন করতে হবে। শিক্ষক ও সমাজ-পরিচালকদের আচার-আচরণ, চিন্তাধারা ও কাজের মান ছাত্রছাত্রী ও সমাজের জন্য অনুকরণীয় হতে হবে।

এদেশ থেকে দেশীয় মূল্যবোধ, মানবতাবোধ, ন্যায়নিষ্ঠা, বিবেকবোধ ইত্যাদি হঠাৎ করে চলতি পথে হারিয়ে গেছে কি না, তার কোনো দিনক্ষণ ঠিক নেই, এটা নিয়ে তর্কে নামারও প্রয়োজন নেই। তবে এ গুণগুলো ফিরিয়ে আনা কোনোক্রমেই সহজসাধ্য কোনো বিষয় নয়। নানা লিমিটিং ফ্যাক্টর একে প্রভাবিত করবে। ফিরিয়ে আনা আবার কঠিন বিষয়ও কিছু নয়। তবে এক মাস বা এক বছরের বিষয়ও এটা না। গঙ্গামুখো পা দিয়ে বসে থাকলে চলবে না, আগে আমাদের ইচ্ছা থাকতে হবে। মানবিক গুণের শিক্ষা ও চর্চা শুরু করতে হবে। একবার ঘটা করে শুরু না করলে এগুলো সমাজে কখনোই স্বেচ্ছায় ফিরে আসবে না। কৃষ্ণচন্দ্র মজুমদারের লেখা কবিতা সপ্তম বা অষ্টম শ্রেণিতে পড়েছিলাম, 'যে চাষা আলস্যভরে, বীজ না বপন করে, পক্ক শস্য পাবে সে কোথায়?' এখন বইয়ের পৃষ্ঠা থেকে শিক্ষামূলক সাহিত্য প্রায় উঠে গেছে। সুকর্ম নেই, চর্চাও নেই, দূরদর্শী সমাজ-পরিচালক নেই, জাত শিক্ষকেরও অভাব। আমাদের টাকা-পয়সা, ঐশ্বর্য, শান-শওকত, আভিজাত্য, চটকদার কথার কোনো অভাব নেই; অভাব মানুষের মতো মানুষের, অভাব আদর্শবান মানুষের, অভাব সমাজে ভালো কথা বলা লোকের। ছাত্রছাত্রীরা শিখবে কোত্থেকে! কয়েক বছর আগে দৈনিক পত্রিকার সাহিত্য কলামে একটা কবিতার অংশ চোখে পড়লো, 'আমার হৃদয় মাঝে কই মাছ খলখল করে'। চোখটা তাড়াতাড়ি ফিরিয়ে নিলাম। আমরা আমাদের অপরিপক্ক ছাত্রছাত্রীদের কোমল হৃদয়ে কই মাছ ও অশ্লিল ছবিতে ভরা মোবাইল ফোন ঢুকিয়ে দিয়ে যতই খলখলাতে চেষ্টা করি, আমাদের বোঝা ও ভাবা প্রয়োজন, তার মনুষ্যত্ববোধের বিকাশ ঘটছে কি না। তারা তো এ সমাজেরই ভবিষ্যত নাগরিক। আবার সেই বানু মোল্লার সায়েরি মনে পড়ছে, 'গড়িবার কালে যার ইস্পাত হলো চুরি, বালি দিলে ধার আসে না খালি লোহার ছুরি'। আমরা ইস্পাত চুরি করে খালি লোহার ছুরিতে ধার আনতে চেষ্টা করছি কেন?

আমাদের দেশের কবি-সাহিত্যিক, শিক্ষক ও সমাজ-পরিচালকদের অপরিণামদর্শী না হয়ে লক্ষ্য রাখতে হবে, যেন এই সম্ভাবনাময় শিশু-কিশোরদের 'হৃদয় মাঝে' কোনো অপশক্তি কই মাছ ঢুকিয়ে খলখলাতে না পারে। প্রতিটা ছাত্রছাত্রীকে দেখলেই যেন চেনা যায় যে, তারা এ দেশের মানবকূলে জন্ম নিয়ে 'মানুষের মতো মানুষ' হয়েছে এবং তাদের হৃদয়ে মনুষ্যত্বের বীজ পুরোপুরি রোপিত হয়েছে, যা অন্য জীবনমুখী ও কর্মমুখী শিক্ষার সম্মিলনে একদিন ফুলে-ফলে সমৃদ্ধ হয়ে এদেশকে সুশোভিত করবে। এটাই আমাদের প্রত্যাশা।

(১৯ সেপ্টেম্বর ২০২৩, দৈনিক যুগান্তর উপসম্পাদকীয় কলামে প্রকাশিত)

ড. হাসনান আহমেদ– অধ্যাপক, ইউআইইউ; গবেষক ও শিক্ষাবিদ; প্রেসিডেন্ট, জাতীয় শিক্ষা-সেবা পরিষদ।